আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

লাল সবুজ বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা

ওয়াহিদা আক্তার

১৯৭৪ সাল। হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটছে বিশ্ব মানচিত্রে সদ্য জন্ম নেওয়া সাড়ে ৭ কোটি মানুষের একটি দেশ বাংলাদেশ। পৃথিবীর দুই পরাশক্তি পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। সদ্যজাত দেশটি যেন একটি নৌকা। হাজারো ষড়যন্ত্রের ছিদ্র নিয়ে উজানে বেয়ে চলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রাণপণে হাল ধরে আছেন। বিজয়ের প্রাক্কালে দেশের বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, দার্শনিকসহ নয় শতাধিক সূর্যসন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। ১ কোটি শরণার্থী পোড়ামাটি ভিটায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট, ভবন, ব্রিজ-কালভার্ট বিধ্বস্ত। চলছে আহত ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি প্রদেশকে দেশে রূপান্তরের জন্য সব ভিত্তি গড়ার কাজ চলছে। নেই কারেন্সি, নেই রিজার্ভ। বঙ্গবন্ধুকে শক্ত হাতে দেশ পুনর্গঠন করতে হচ্ছে। খেতে ফসল ফলাতে পারেনি কৃষক। রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা সবার হাতে অস্ত্র। পাকিস্তানিরা যাওয়ার সময় রাজাকারদের হাতে অস্ত্র দিয়ে যায়। দালাল শ্রেণিরা সুযোগ বুঝে কালোবাজারি মুনাফালোভীর ভূমিকায়। মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী চক্র ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল একাট্টা হয়ে সব কিছুতে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবায় চট রপ্তানি করার কারণে মার্কিন খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ ফিরে যায়। দেশে শুরু হলো নতুন যুদ্ধ-অভাব। কিছুটা সত্য বাকিটা ছিল পরিকল্পিত। রাতারাতি যেন সবাই স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন চায়। বঙ্গবন্ধুকে কেউ যেন সময় দিতে চাইছে না।

এমনই একটি সময় দেশ-বিদেশে ছাপা হলো মানবেতর দুর্ভিক্ষের ছবি 'বমি ভক্ষণের ছবি'। পরে জানা গেল অল্প ক'টা টাকার জন্য এ কাজ করেছিল এক গরিব লোক। আর এ কাজের পেছনে হোতা ছিল এক বিদেশি সাংবাদিক। তাদের এমন একটা হৃদয়বিদারক ছবি প্রয়োজন ছিল। অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারেনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, ক্ষুধার প্রকোপকে পুঁজি করে বঙ্গবন্ধুকে বিব্রত করতে ও ব্যর্থ প্রমাণ করতে চেয়েছিল দেশি-বিদেশি সেসব ষড়যন্ত্রকারী। মুক্তিযুদ্ধ করে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তা পুনর্গঠনের দায়িত্ব ছিল সবার। কিন্তু সবাই এই দায়িত্ব নেয়নি। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের দায়িত্ব নিয়ে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এমনই একটি প্রেক্ষাপটে কবি রফিক আজাদ বিতর্কিত কবিতাটি লেখেন যা তখনকার ষড়যন্ত্রকারীদের দেওয়া আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে। অনেকের হয়তো মনে আছে এই অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা কবি রফিক আজাদের একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতার শিরোনাম সে সময় খুব বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা। তিনি সরকারকে কটাক্ষ করে এ ধরনের কবিতা লিখতে পারেন কি না প্রশ্ন উঠেছিল। গণকণ্ঠ পত্রিকাটিতে কবিতাটি ছাপা হয়।

"ভাত চাই–এই চাওয়া সরাসরি ঠান্ডা বা গরম
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চালে হলে
কোনো ক্ষতি নেই–মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাই;
দু'বেলা, দু'মুঠো হলে ছেড়ে দেব অন্যসব দাবি।"

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার দেশের মানুষ যদি পেট পুরে ভাত না পায় তাহলে এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে"। আজ সেই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। সেই সাড়ে ৭ কোটির বাংলাদেশ এখন সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশ। কেউ না খেয়ে থাকে না। ভাতের অভাব নেই বাংলাদেশে, কাপড়ের অভাব নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে সবার। বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল বলা হচ্ছে। অর্থনীতিতে শীর্ষ ৩৫টি দেশের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ একটি। দরিদ্র মানুষ সরাসরি ঘর পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আছে শতকরা ২০ ভাগ দরিদ্র মানুষ। যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন পৃথিবীর নজর কাড়ছে। তারপরও আমাদের দেশে মন ছোট করা সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছরের প্রাক্কালে ছাপা হয় এক নদী রক্ত দিয়ে অর্জন করা স্বাধীনতার প্রতি অবমাননা সূচক কথা। স্বাধীনতা অর্জনের ব্যথা, বেদনা, দহন, যন্ত্রণা সবাই অনুভব করতে পারে না।

আমরা বাঙালি। দোষে-গুণেই বাঙালি, বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি। এই আবেগ মহৎ আবেগ। এই আবেগ না থাকলে অনেক মহৎ অর্জন সম্ভব ছিল না। হাজার হাজার বাঙালি বিপুলভাবে জেগে উঠেছিল বলে তৈরি হয়েছে লাল সবুজের বাংলাদেশ। হাজার হাজার বাঙালিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নেতা জন্মেছিলেন এই দেশে, তিনি সেই নেতৃত্বটা দিতে পেরেছিলেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সবার আবেগ তাঁর মধ্যে পেয়েছিল সবাই। সবার হয়ে তিনি কথা বলেছিলেন। তিনি কী করতে চান, কী তাঁর লক্ষ্য, কেন করতে চান সব আদ্যোপান্ত কৈফিয়ত তিনি দিয়েছিলেন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে, লাখ লাখ জনতা সেদিন বাঁশের লাঠি উঁচু করে সমর্থন দিয়েছিল তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বাঙালি লড়েছিল এক অসম শক্তির সঙ্গে। বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার ছাত্রসমাজ দেশমাতৃকার মুক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়াকে কর্তব্য মনে করেছিল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে তাঁর আদর্শে তাঁর নামে নয়টি মাস যুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

যে পরিবার থেকে কেউ শহীদ হয়নি, যে পরিবার মহান স্বাধীনতার জন্য কোনো ত্যাগ করেনি তাঁরা এই অর্জনের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে না। স্বজন হারানো বেদনার রক্তক্ষরণ যারা হারায়নি তাঁরা বুঝবে না। স্বাধীনতা যুদ্ধের যে বিপুল আয়োজন দেখা গেল ১ কোটির বেশি লোক বাড়িঘর, সংসার, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, মা-বাবার মায়ার টান ফেলে যুদ্ধে চলে গেল। কতদিন যুদ্ধ চলবে, কী খাবে, কোথায় খাবে, ফিরবে কি না এসব চিন্তা না করে দেশমাতৃকার টানে তাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিল। ইতিহাসে সবার নাম লেখা নেই। তবে আমরা সেসব শহীদ আত্মার মাগফিরাত কামনা করে কথা বলি, শহীদদের ত্যাগ স্মরণ করি কৃতজ্ঞতা চিত্তে। যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন তাঁদের সম্মানের চোখে দেখি।

বাঙালি বীরের জাতি। বাঙালি বিস্ময়কর আবেগপ্রবণ জাতি। যাঁদের মহান আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাঁদের অবদানকে খাটো করে দেখার, বলার যে অপরাধ তা ক্ষমার অযোগ্য।

কবি রফিক আজাদ জীবদ্দশায় সেই কবিতার জন্য আত্মগ্লাঘায় ভুগেছেন। কবি মননে যে দহন চলেছিল তা তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন। "একটা ভুলের ভেতর থেকে কবিতাটি লিখেছিলাম।" সেই ভুলটা কবিতার ভুল না। দৃষ্টির ভুল। পরিবেশিত তথ্যের ভুল ছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের এক সাংবাদিক পরিচিতি পাওয়ার জন্য বাসন্তী নামের একজন দরিদ্র মেয়েকে জাল পরিয়ে ছবি তুলেছিল। ১০০ টাকার বিনিময়ে আর একজনের বমি খাওয়ার ছবি তুলেছিল বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে। এসব দেখে তিনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, এরপর কবিতাটি লিখেন। "আমি সবার কাছে বলতে চাই সেই বাসন্তী ছিল সাজানো। কবিতা লেখার সময় বা তার পরেও জানাছিল না যে ছবিটা ছিল ভুল। মরার আগে সে আমারে বলেছে। ওই... বাচ্চা ফটোগ্রাফারের ছবি দেইখা আমি কবিতাটি লিখতে বসেছি।" মৃত্যুর আগে সেই ফটো সাংবাদিক তাকে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা। তাঁর লেখায় রাষ্ট্রদ্রোহীর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তাঁর স্মৃতি কথায় "আমার তো বড় ভাগ্য! ভাগ্য ভালো না হইলে আমি কবে মারা পড়তাম! অনেকেই বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দিল। দেশ সবে মাত্র স্বাধীন হইছে। পাকিস্তানের গন্ধ তখনো আমাদের আকাশে-বাতাসে। কিছু সুবিধাবাদী কবিকে ধরতে চাইছিল তা আর পারে নাই।"

পরিচিত একজন তাঁকে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু সব কথা শোনেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ফোন দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "ওরে পাঠাইলাম। ওর কথা শুনে এই গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। আর কোনো কথা বলেন নাই।" জানা যায় এসবি অফিস তাঁকে এক দিস্তা কাগজ ও দুই কাপ চা দিয়েছিল। কবি ৬১ পৃষ্ঠার মতো দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কেন তিনি ভুল পর্যবেক্ষণে এ ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। যা হোক তৎকালীন হক কথা ও গণকণ্ঠ পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে বিব্রত করতে একের পর এক ছবি, প্রবন্ধ, শিরোনাম ছেপে যায়।

পরবর্তীতে কবি যতদিন বেঁচেছিলেন বঙ্গবন্ধুর এই মহত্ত্বের কথা ভোলেননি। পরে তিনি 'এই সিঁড়ি' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন তাঁর আত্মদহন থেকে। কিন্তু ততদিনে ওই বিতর্কিত কবিতার শিরোনাম, বাসন্তীর জাল পরা ছবি, বমি ভক্ষণের ছবি স্বাধীনতা বিরোধীদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে কোনো সংবাদপত্রকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। নেতিবাচক সংবাদ থেকে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। সংবাদপত্রকে এ জন্য সমাজের দর্পণ বলা হয়। দেশের জাতীয় ভাবমূর্তি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সম্মান বৃদ্ধির জন্য সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্মভাবে সংবাদপত্র মানুষের মননে ও মগজে প্রভাব বিস্তার করে। তখন পৃথিবীতে খাদ্যাভাব ছিল। বাংলাদেশেও যুদ্ধের পরে অভাব থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। কোনো দেশ বেশি অভাবগ্রস্ত ছিল, কোনো দেশের জনগোষ্ঠী মোটামুটি খেতে পারছিল। দুই পরাশক্তির মেরুকরণে ছোট ছোট দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। যা হোক এসব বিতর্কিত কবিতা, সাজানো ছবি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসার চির ধরানোর অপপ্রয়াস।

অপপ্রচারের নির্মম শিকার বঙ্গবন্ধুর পরিবার। বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে বিতর্কিত ও অজনপ্রিয় করতে বেছে নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু পরিবারের আলোমুখী একটি টগবগে তরুণ বঙ্গবন্ধুর বড় পুত্রসন্তান শেখ কামালকে। মাত্র ২৬ বছরের একটি তরুণ সাংস্কৃতিক অঙ্গন, ক্রীড়াঙ্গনকে আলোকিত করে রেখেছিলেন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে। তিনি ছিলেন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা একাধারে ক্রীড়া সংগঠক, আবাহনী ক্লাব তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত। ছিলেন স্পন্দন নামে শিল্পীগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। খেলাধুলা, অভিনয়, সেতার বাজানো প্রাণোচ্ছল বন্ধুঅন্তপ্রাণ শেখ কামাল সদ্য স্বাধীন দেশে নানা বিশৃঙ্খলা নিরসনে সরাসরি ভূমিকা রাখার কারণে তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। হলুদ সাংবাদিকতার শিকার ছিলেন তিনি।

শতকরা একভাগ লোক বিশ্বাস করলেও অপবাদ রটনাকারীরা নিজেদের স্বার্থক মনে করে। মিথ্যার দাপট তাৎক্ষণিক ও ভয়ংকর হলেও সত্যের গৌরব চিরস্থায়ী হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পৃথিবীর ভয়াবহতম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রথম শিকার হন এই আলোকদীপ্ত প্রাণ শেখ কামাল, আজ সব কুয়াশা ভেদ করে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় দেশের ক্রীড়াঙ্গন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে আছে শহীদ শেখ কামাল। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে তত দিন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অবদান মানুষের মুখে উচ্চারিত হবে। বঙ্গবন্ধু যতদিন বেঁচেছিলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মায়া-মমতায় জড়াজড়ি করে সারা বাংলার দুঃখী মানুষকে হৃদয়ে নিয়ে মহানায়কের মতো মাথা উঁচু করে বেঁচেছিলেন। মৃত্যুহীন প্রাণগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আল্লাহ বোধহয় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যাকে রক্ষা করেছিলেন সেদিন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থেকে দেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিয়ে গেছেন। মানুষের জীবন মান ও গড় আয়ু বেড়েছে। বঙ্গবন্ধুর বেঁচে থাকা কন্যাদের একমাত্র স্বপ্ন– যে দেশের জন্য তাঁদের পিতা জীবনের সুবর্ণ সময়গুলো নির্জন কারা প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন, যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের মা, বাবা, ভাই সারা জীবন অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন, ত্যাগ করেছেন জীবনের সব বিলাসিতা, সেই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন তাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা দেখেছি এক/এগারোর সময় সংবাদপত্রের অপেশাদার সংবাদ পরিবেশন। দেখেছি পদ্মা সেতুর দুর্নীতি নিয়ে অনুমাননির্ভর সংবাদ পরিবেশন। স্বাধীনতার সব অর্জনকে পাশ কাটিয়ে একপেশে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশের অর্থনীতির চেয়ে স্থিতির সঙ্গে টিকে আছে এবং টিকে থাকবে, ইনশা আল্লাহ।

সব দেখেশুনে মনে হয় এ দেশের কারও কারও কাছে 'বমি ভক্ষণের' ছবি ও 'বাসন্তীর জাল পরা' ছবির এখনো চাহিদা আছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে উন্নয়নের সড়কে তুলে দেশকে এগিয়ে নিয়েছিলেন তখন যারা দেখতে পায়নি তেমনি শেখ হাসিনা যে দেশটাকে দ্রুত উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছেন তারা দেখতে পাবে আশা করি না। এ জন্য সুযোগ পেলেই তারা ইস্যু তৈরি করে ছবি খোঁজে ইংরেজিতে লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে, মুখে মাস্ক দেওয়া ছবি, অমুকের মুক্তি চাই লেখা ছবি। যেন সরকার মানুষের বাক-স্বাধীনতা কে না হরণ করছে। এসব ছবির পেছনে যে বাঙালির চিরন্তন আবেগ অনুভূতির তথা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে খাটো করার আঘাত রয়েছে তা সবাই বুঝবে না। আমরা ঘর পোড়ার আগুন দেখেছি তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পেয়ে যাই। সময় আছে। সাধু সাবধান। জয় বাংলা।

■ লেখক : সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়